Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৬ আগস্ট, ২০২২

৪৫ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১৫ আগস্ট, ২০২২, সোমবার, ২৯ শ্রাবণ, ১৪২৯

## আজ ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস

## বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষার্থে প্রাক্তনীরা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ আগস্ট বর্ধমান :** ঐতিহ্যমণ্ডিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে পথে নামছেন শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী সহ শিক্ষানুরাগীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অব্যবস্থা চরম আকার নিয়েছে। পড়াশুনা ও সময় মতো ফল প্রকাশ হচ্ছে না তার সঙ্গে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি। এইসব গুরুতর অভিযোগ নিয়ে ১৩ আগস্ট বর্ধমান এবিটিএ হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রাক্তন আধিকারিক ও পরিচালকরা। ছিলেন প্রাক্তন ই.সি সদস্য জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, পরীক্ষাসমূহের প্রাক্তন নিয়ামক সুকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন ডিন অরূপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। দল-মত নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামকে বজায় রাখতে সর্বস্তরের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

## যুবদের মিছিল ও বিক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৩ আগস্ট :** আজ বিকালে গলসী পূর্ব বাসস্ট্যান্ডে চোর ধরো, জেল ভরো—এই দাবিতে প্রতিবাদসভা করল ডি ওয়াই এফ আই গলসী ২নং আঞ্চলিক কমিটি।

লুটেরাদের হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে, কর্পোরেট দালালদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে, দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছরে দেশের স্বাধীন সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করে কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করতে সভায় বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চন্দন সোম, গলসী-২ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনসিজ হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাখন আঁকুড়ে। উপস্থিত ছিলেন রাজীব সাম, অশোক মণ্ডল, দেবব্রত দাস, মহাদেব বাগদি ও স্থানীয় কর্মী সমর্থকরা।

শুধু কলকাতা ও বীরভূমের পার্থ চ্যাটার্জি এবং অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার

*—এরপর চারের পাতায়*

## যুদ্ধ-বিরোধী পদযাত্রা

**নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ৭ আগস্ট :** পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ মেমারি এক বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে মেমারি সোমেশ্বরতলা আটচালায় দুপুরে এক অঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। প্রতিযোগিতায় মেমারির বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। মোট ৫০ জন ছাত্রছাত্রী অঙ্কন প্রতিযোগিতায় যুদ্ধ-বিরোধী ছবি আঁকে। শেষে একটি যুদ্ধ-বিরোধী মিছিল আয়োজিত হয়। মিছিল মেমারি সোমেশ্বরতলা থেকে স্টেশন বাজার পরিক্রমা করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন অমিত বিশ্বাস, রঞ্জন কবিরাজ, তাপস পাল, বৈদ্যনাথ হেমব্রম, ও বিজ্ঞানমঞ্চের বিভিন্ন সদস্যরা। ৬ আগস্ট পৃথিবীর অন্যতম কুখ্যাত একটি দিন। তাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে ও পরমাণুঅস্ত্রহীন পৃথিবীর দাবিতে ৭৭তম হিরোশিমা দিবসে খানো হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গড়ে তুললো ইকো ক্লাব। পরিচালনায় সহযোগিতা করবে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বুদবুদ গলসী বিজ্ঞান কেন্দ্র। কেন্দ্রের সভাপতি আশীষ চক্রবর্তীর কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী পড়ুয়াদের মন কাড়ে। বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের হাতে কাঁঠাল গাছের চারা দেওয়া হয়। বুদবুদ বিজ্ঞান চক্রের পক্ষ থেকে স্বরূপানন্দ পল্লীতে হিরোশিমা দিবস পালিত হয়েছে। আলোচনা করেন সম্পাদক দেবদুলাল রায় ও আশীষ চক্রবর্তী।

## অংকন-এর শিল্পকলা প্রদর্শনী

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** বর্ধমানের চিত্রকর ও ভাস্করদের সংস্থা 'অংকন'-এর শিল্পকলা প্রদর্শনী ৩ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট হয়ে গেল কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর নিউ সাউথ গ্যালারিতে। ৩ আগস্ট উদ্বোধন করেন ভাস্কর তাপস সরকার। উপস্থিত ছিলেন কবি ও আলোচক অঞ্জন সেন। প্রভাত মাঝি, পূর্ণেন্দু দে, শ্যামলবরণ সাহা, বিশ্বনাথ দে, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ভার্গব মুখোপাধ্যায়, অমিত দে, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, ক্ষীরোদবিহারী ঘোষ, প্রদ্যুৎ পাল, পার্থপ্রতিম মণ্ডল, দেবাশিস অধিকারী, অনুপ সাহা, শংকর দে, সর্বাণী চাকলাদার, কার্তিক সাধু, শুভজিৎ কুণ্ডু, অতনু চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম বিশ্বাসের আঁকা চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়।

# বৃষ্টি হলেও আমন চাষে এখনও বাধা, আশঙ্কায় কৃষক

**কিশোর মাকর :** কোথাও ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কোথাও ঝেঁপে বৃষ্টি। দুদিনের বৃষ্টিতে ধান রোয়ানোর কাজ শুরু হয়েছে জোর কদমে। কৃষি দপ্তরের মতে আগস্ট মাসে এখনও অনেকটাই বৃষ্টির পরিমাণে ঘাটতি আছে। তবে রোয়ার কাজ আটকাবে না। এখনও পর্যন্ত ২ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয়ে গেছে। লক্ষ্যমাত্রা আছে ৩ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর জমি। আলিপুর আবহাওয়া জানাচ্ছে আগামী দুদিন বৃষ্টির মাত্রা আরো বাড়বে।

একদিকে দেরিতে চাষ, অন্যদিকে চাপানের দাম বৃদ্ধি জোড়া ফলায় চাষির আশঙ্কায় দিন কাটছে। বীজের বয়স বাড়ায় ফলনে প্রভাব পড়ে। তার ওপর দেরিতে চাষ ফলনে মার খাবে। ফলে শস্য ভাণ্ডার চাল উৎপাদনে মার খাবে। চালের দাম চলে যাবে নাগালের বাইরে। গত বোরো চাষে উৎপাদন মার খাওয়ায় চালের দাম এখনই লাগামছাড়া। ভাতারের চাষি গোলাম রব্বানী জানালেন এখন দেরিতে চাষ, তারওপর সার, ওষুধের দাম বৃদ্ধিতে খরচ বাড়ছে। উৎপাদন কম হবে। লোকসান জেনেই চাষ করছি। সারা বছরের ভাতের সংস্থানের ব্যবস্থা। ৫ বিঘা জমি। ৪ বিঘা জমিতে লাল স্বর্ণ, ১ বিঘাতে মিনিকিট। যে পটাশ গতবার কিনেছি ৯০০ টাকা বস্তা, এবার কিনতে হচ্ছে ১৮০০ টাকা বস্তা (৫০) কেজি। ডিএপি কিনছি ১৮০০ টাকা। গতবার যেখানে দাম ছিল ১৩০০ টাকা। ইউরিয়া ৩৫০ টাকা বস্তা। গতবার ছিল ৩০০ টাকা বস্তা। সমস্ত খরচ খরচা করে ধান ওঠা পর্যন্ত ১৪০০০-১৫০০০ টাকা বিঘা প্রতি খরচ হবে। সরকার এম.এস.পি ঘোষণা করেছে ২০৪০ টাকা কুইন্টাল। অর্থাৎ ১২৩৬ টাকা বস্তা (৬০) কেজি। এবার উৎপাদন কম হওয়ার কারণে বিঘা প্রতি ৮ বস্তা ধান হয়। ৮x১২৩৬ টাকা = ৯৮৮৮ টাকা। অর্থাৎ১৫০০০-৯৮৮৮ = ৫১১২ টাকা লোকসান বিঘা পিছু। যদি সব ধান সরকারের ঘরে বিক্রি করতে পারে। সরকার স্বামিনাথন কমিশনের সুপারিশ মানছে না। উৎপাদন খরচ বাড়ছে কিন্তু সে তুলনায় এম.এস.পি ঘোষণা বৃদ্ধি হচ্ছে না। এখন দেখার, চাষি খাদের কিনারা থেকে কতটা দূরে থাকবে তা সময় বলবে।

# শস্যবিমার টাকা না পেয়ে ব্যাঙ্কের সামনে চাষিদের বিক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ অগাস্ট, মেমারি :** মেমারির রাধাকান্তপুরে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সামনে কৃষকদের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা। চাষিদের অভিযোগ ২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আলু চাষে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখনো পর্যন্ত শস্যবিমার টাকা পাননি তারা। একাধিকবার এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানিয়ে কোন সমাধানসূত্র মেলেনি। ফলে আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় চাষিদের। ব্যাঙ্ককর্মীদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

তাদের দাবি ছিল শস্য বিমার ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার তারিখ নির্ধারিত করার পর ব্যাংক কর্মীদের ব্যাংকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মেমারি থানার পুলিশ। পুলিশী আশ্বাসে ওঠে বিক্ষোভ। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানান ইন্সুরেন্স কোম্পানির কিছু সমস্যা থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের শস্যবিমার ক্ষতিপূরণ দিতে কিছুটা দেরি হয়েছে। তবে আগামী ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে দ্রুত সেই ব্যবস্থা করা হবে। জানা যায় ৪২১ জন আলুচাষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

## ইউ সি আর সি-এর প্রতিষ্ঠা দিবস

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ অগাস্ট :** সারা রাজ্যের সাথে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা, মেমারি, বর্ধমান সদর, গলসী ও বর্ধমান শহরের মোট ১০টি জায়গায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ইউ সি আর সি-র প্রতিষ্ঠা দিবস মর্যাদার সাথে পালিত হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসে বড়নীলপুর আমবাগানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নন্দদুলাল গুহ সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা দেবাশীষ সেন, দীপঙ্কর দে সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ইছলাবাদ কলোনীতে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক দুলাল নাগ সহ গৌতম সরকার, শিবশঙ্কর সাহা, দেবদুলাল ঠাকুর, প্রশান্ত দাস চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কাঞ্চননগরে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব মদন কর্মকার, গোপাল দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনের ফলে অখণ্ড ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়। কংগ্রেস দল ও সরকারের পক্ষ থেকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত আশ্রয় প্রার্থীদের ভারতের মাটিতে ন্যায় সঙ্গত ও উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিলো। ১৯৪৭ সালে ১৬ জুলাই মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন ''দেশ বিভাগের কারণে যে সকল উদ্বাস্তু ভারতে আসতে বাধ্য হবেন তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করবে।'' কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

## রক্তদান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ৭ আগস্ট :** ডি.ওয়াই.এফ.আই এবং এস.এফ.আই গুসকরা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে বাসস্ট্যান্ড সন্নিকট প্রয়াস হলে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির রশ্মি ব্লাড সেন্টারের সহযোগিতায় এই শিবিরে ৫৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রতিটি রক্তদাতার হাতে একটি গাছের চারা ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন চিফ হুইপ সৈয়দ মোঃ মসিহ।

## শিক্ষক সম্মেলন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৩ আগস্ট :** আজ গলসী জোনাল এবিটিএ-এর দশম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন গলসী হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হলো। মোট ৫১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জেলা মহকুমা নেতৃত্বের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শিবশংকর সাহা এবং সুহাস সামন্ত। প্রতিনিধিদের প্রাণবন্ত আলোচনায় সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

## বকুলফুলের কবিতা উৎসব

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ আগস্ট :** 'বকুলফুল' সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে হয়ে গেল বকুলফুলের আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব। উপস্থিত ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী, জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, রত্না রশিদ ব্যানার্জী, দিলীপ রায়, অধ্যাপক নিগমানন্দ মণ্ডল ও বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক ও গীতিকার খান আখতার হোসেন, বকুলফুল সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদিকা মিনতি গোস্বামী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার সভানেত্রী সুষমা মিত্র। এদিন বকুলফুলের একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

## কালনায় মহিলা সমিতির সম্মেলন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ আগস্ট :** মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কালনা মহিষমর্দিনী ইন্সটিটিউশনে অনুষ্ঠিত সারা ভারত মহিলা সমিতির কালনা শহর এরিয়া কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলনে। উদ্বোধন করেন মহিলা নেত্রী জয়শ্রী চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আলেয়া বেগম।

এই সম্মেলনে সংবর্ধনা জানানো হয় কালনা পৌরসভার একমাত্র বাম কাউন্সিলর শর্মিষ্ঠা নাগকে। শতাধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ করা সম্মেলনে খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদিকা জনা মুখার্জি। এই প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন কালনার ১৮টি ওয়ার্ডের প্রতিনিধিরা। শেষে মিত্রা ঘোষকে সভানেত্রী এবং মণিপ্রভা ভাদুড়িকে সম্পাদিকা করে ২৫ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

# নতুন চিঠি

১৫ আগস্ট, ২০২২


## শিয়রে শমন

আজাদির অমৃত মহোৎসব, পার্থ চ্যাটার্জির বান্ধবীর ফ্ল্যাটে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার, পার্থর বিরুদ্ধে কুণালের বিষোদগার, উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন ইত্যাদি বড় মিডিয়া ফুটেজের নিচে যেটা চাপা পড়ে যাচ্ছে তা হল অত্যাবশ্যক পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির খবর। খুচরো পণ্যে ৬.৫ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি আর পাইকারিতে ১৪.৫ শতাংশ শেষ কবে হয়েছে হিসেব কষতে অর্থনীতিবিদদের খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে। চাল, আটা, ডাল, ভোজ্য তেলের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়িয়ে পরিবহণ ব্যয় বাড়তে দিয়েছে। রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ১০০০টাকার বেশি হয়েছে, হেঁশেলে ছেঁকা লেগেছে। সম্প্রতি আবার গা-জোয়ারিভাবে প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের ওপর জিএসটি চাপানো হয়েছে। ফলে দাম আরও বাড়তে চলেছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়া মানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া অর্থাৎ যতটা ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করা আবশ্যক তার থেকে কম করতে বাধ্য হওয়া। নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের কাছে এর আর একটা অর্থ হল আয় কমে যাওয়া, একই মেহনত করে কম রোজগার করা। টাকার অঙ্কে রোজগার না কমলেও একই পণ্য কিনতে বেশি টাকা খরচ হওয়া মানে পরোক্ষভাবে রোজগার কমে যাওয়া।

এর সবটা যে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে তেমনটা নয়। হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণে বদ্ধপরিকর মোদি সরকার আমজনতাকে ধর্মের আফিং খাইয়ে রেখেছে। ফলে 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়' ভাবতে গিয়ে তাদের যে পকেট খালি হয়ে যাচ্ছে তা কার দোষে ঘটছে মানুষ তা তলিয়ে ভাবছে না। আর এ রাজ্যের দিদিমণি যিনি নাকি মোদিজিকে কোমরে দড়ি পড়ানোর কথা বলেছিলেন তিনি ভাইপো আর সরকার বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রীর চরণবন্দনা করতে দিল্লি ছুটছেন। যে ধনকড় রাজ্য সরকারের চক্ষুশূল ছিলেন, উপরাষ্ট্রপতি পদে তাঁর নির্বাচন যাতে নিষ্কণ্টক হতে পারে তা নিশ্চিত করতে টিএমসি সাংসদদের ভোটদানে বিরত রাখতেও দিদিমনির লাজ লাগল না।

আসলে ক্ষমতার ভাগাভাগি আর অপশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা দুটো ভিন্নপথ। লেসার ইভিল বলে বিধানসভা ভোটে যারা টিএমসিকে পরোক্ষে সমর্থন দিয়েছিল তারাও চুপ। দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া রাজ্যের শাসকদলের ইচ্ছাও নেই ক্ষমতাও নেই মানুষের এই দুর্গতিতে তাদের পাশে দাঁড়ানোর। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে বামেদের এগিয়ে আসতে হবে। আদর্শের প্রতি বামেদের নিষ্ঠা প্রমাণিত। মানুষের সমর্থন নিয়ে আজ তাই গণশত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে বামেদেরই নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে হবে।

# সার্ধজন্মশতবর্ষে অরবিন্দ

**সুকৃতি ঘোষাল**

১৫ আস্ট, ২০২২ যেমন ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর, ঠিক তেমনি অরবিন্দ ঘোষের জন্মসার্ধশতবর্ষ। রেঁমা রোঁলার মতে, ইউরোপীয় ও এশীয় প্রতিভার সম্পূর্ণ সংশ্লেষ ('the completest synthesis') হলেন শ্রী অরবিন্দ। অরবিন্দের ৭৮ বছরের জীবনের ৭-২১ এই ১৪ বছর কাটে ইংল্যান্ডে—তখন তাঁর শিক্ষাকাল। ১৯১০ সালে তিনি নিভৃতে যোগসাধনার জন্য চলে যান পণ্ডিচেরি এবং ১৯৫০ সালে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত ওই স্থানই হয় তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বরোদার মহারাজের সচিবের কাজ নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন ও ৪ এপ্রিল, ১৯১০ দুপ্লে জাহাজে পণ্ডিচেরি গমনের মধ্যবর্তী সময়ই আমরা পাই সেই অরবিন্দকে 'ঋষি' নন, রাজ সচিব, শিক্ষক, অধ্যক্ষ, 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক ও বিপ্লবী। বহু ভাষাবিদ, অসাধারণ মেধাসম্পদের অধিকারী (তিন বছরের ট্রাইপস তিনি দু'বছরে সম্পূর্ণ করেন) অরবিন্দ বাচনে নয় যাপনে দেশপ্রেমী ছিলেন। বরোদার চাকরি তিনি ছেড়ে দেন এবং কলকাতার জাতীয় কলেজে অধ্যক্ষের পদে ব্রতী হন অবশ্যই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য, কারণ তখন কলকাতাই ছিল দেশের রাজধানী। আবার দেশসেবার জন্য, বিপ্লবী কাজকর্মে যুক্ত হওয়ার জন্য, তিনি সেই অধ্যক্ষতার পদে ইস্তফা দেন। তাঁর বিদায়ী ভাষণে তিনি ছাত্রদের বলেন, অর্জিত জ্ঞান দিয়ে তারা যেন দেশকে পুষ্ট করে, 'sork that she (India) may prosper, sufter that she may rejoice'।

বিপ্লবী অরবিন্দের বাস্তবজ্ঞান ছিল প্রখর, তিনি বুঝেছিলেন প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করা যাবে না। তাই তিনি গুপ্তসমিতি গঠন করে অস্ত্র সংগ্রহ ও অস্ত্র প্রয়োগের ওপর সবিশেষ জোর দেন। এহেন এক দেশপ্রেমীর আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় মাত্র এক বছরের হাজতবাসে সংগ্রামমার্গ থেকে, সাধনমার্গে প্রবেশ স্বভাবতই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অরবিন্দ নিজে জেলে 'বাসুদেব দর্শন' ইত্যাদির কথা বলেছেন, কিন্তু এই রূপান্তরের কি অন্য

ব্যাখ্যা সম্ভব? আসলে অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে মানুষ নিজে দুর্বল, এক অসম্পূর্ণ যন্ত্রবিশেষ। ঊর্ধশক্তির প্রভাবেই সে শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে এবং তখনই অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়। এই বিশ্বাসই সম্ভবত তাঁকে কর্ম থেকে যোগের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তবে দেশের শৃঙ্খলমোচনের কাজটা যে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, কিন্তু তা যে করা দরকার সেটা তিনি অন্তরালে যাবার আগেও বিস্মৃত হননি। বরং তিনি লিখেছেন যে দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত এক ঝাঁক তরুণ যখন সে কাজের জন্য প্রস্তুত হয়েছে তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি হবে না। অরবিন্দের স্থির প্রত্যয় 'তোমার ভয় কি? যদি তুমি সরে দাঁড়াও অথবা নিদ্রিত হয়ে পড়ো তথাপি কাজটি আটকে থাকবে না'।

১৯৪৭ ১৫ আগস্ট তাঁরই জন্মদিনে যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন অরবিন্দ যে ভাষণ দেন তাতে তিনি তাঁর চারটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন— (১) বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা, (২) এশিয়ার পুনরুত্থান ও মুক্তি, (৩) বিশ্ব মিলন, (৪) ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাবনার বৈশ্বিক প্রসার। প্রথম স্বপ্ন সাধনের জন্য তিনি স্বল্পকালের জন্য বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন। শেষের তিনটি স্বপ্নপূরণের জন্য যৌগিক শক্তির ওপর তাঁর নির্ভরতা। শুধু এটুকু বললেই অরবিন্দকে বোঝা যাবে না। ভারতের স্বাধীনতার পথ যে সাম্প্রদায়িকতার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত তা দেখে তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তিনি যথার্থই ভেবেছেন "if it (communal division) lasts, India may be seriouly weakened and crippled"। আজ যাঁরা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিটিয়ে দেশভক্ত সাজছেন তাঁরা অরবিন্দের এই কথা খেয়াল করেন তো? আর 'ঋষি' অরবিন্দকেও আর একটু বোঝা দরকার। তাঁর অধিমানসের মর্তাগমন তত্ত্ব না হয় সাধারণ বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু তাঁর ধর্ম বিষয়ক ভাবনা খুব জটিল নয়। অরবিন্দের ধর্ম যত না বিশ্বাস বা মতবাদ-নির্ভর তার থেকে ঢের বেশি যাপন-নির্ভর। অর্থাৎ এ এক শুদ্ধ জীবনচর্চা, অরবিন্দের ভাষায়, "এমন এক জিনিস যা শুধু বিশ্বাস করার নয়, পরন্তু জীবনে ফুটিয়ে তোলার"। এই ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আচারের ফাঁদে পড়ে মানুষে মানুষে ঠোকাঠুকি হোক অরবিন্দ চাননি। ১৯০৯ সালে উত্তরপাড়া অভিভাষণে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "কোনো ধর্ম যদি সার্বজনীন না হয় তবে তা সনাতন হতে পারে না। কোনো সংকীর্ণ ধর্ম, সাম্প্রদায়িক ধর্ম, অনুদার ধর্ম, কেবল স্বল্পকাল ও সীমাবদ্ধ সামান্য উদ্দেশ্যের জন্যই জীবিত থাকতে পারে।" এ কথার গভীরে যদি আমরা প্রবেশ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে এখন যেসব ধর্ম আচারসর্বস্ব প্রচলিত রয়েছে তা নশ্বর বলেই মনে করতেন অরবিন্দ। উদার ধর্ম, যাকে 'সনাতন হিন্দুধর্ম' না বলে আমরা মানবতা বলতে পারি, একমাত্র শাশ্বত ধর্ম, কারণ তা 'সার্বজনীন'।

# স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের উজ্জ্বল ভূমিকা

**অতনু হুই**

সাত সাতটা দশক পেরিয়ে আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষে উপস্থিত। লালকেল্লা থেকে আবার স্বপ্ন ফেরি করা হবে। আবারো দেশজুড়ে দেশপ্রেমের প্লাবন বয়ে যাবে। স্বাধীনতার রক্তরঞ্জিত বেদীমূলে প্রকৃত দেশপ্রেমী মানুষদের আত্মত্যাগের যথার্থ ইতিহাসকে সুকৌশলে ভুলিয়ে রাখা হবে। আর সেদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে বেইমানি করা হিন্দুত্ববাদীরা, যারা আজ শাসন ক্ষমতায়, তারা আজ মহান দেশপ্রেমিক সেজে দেশ বন্দনার বিকৃত মেকিপনার পরিসরে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বপ্নগুলোকে হত্যা করে চলেছে।

কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম, নির্দয়। কালের গহ্বর থেকে সত্যের আলোকে প্রমিথিউসের মতো সে জাগরিত করবেই। তাই, ইতিহাসের পাতায় অনুচ্চারিত থাকলেও কমিউনিস্টদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলত তিনটি ধারার ছিলো— (১) জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ধারা। (২) সশস্ত্র বিপ্লববাদী ধারা। (৩) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক মুক্তি সংগ্রামের ধারা।

আধুনিক ইতিহাস চর্চায় 'হিসট্রি ফ্রম বিলো' বা নিচের তলার মানুষের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই হিসাবে সাধারণ মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে এখন আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চর্চা এবং সেখানে সাধারণ শ্রমিক কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

**স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট ভাবনা :**

কমিউনিস্টদের জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতা বোধে সম্পৃক্ত। কাজেই একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট সাচ্চা দেশপ্রেমী হলেও একজন যথার্থ আন্তর্জাতিকতাবাদী। মেহনতিদের দেশ নেই।

আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লবের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অধিবেশন থেকে (মার্চ, ১৯১৯)—দেশে দেশে উপনিবেশগুলিতে মুক্তি আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। লেনিনের নেতৃত্বে 'বিশ্বের সর্বহারাদের প্রতি' নামক এক দলিলে—'সকল দেশের মজদুর ও মেহনতি মানুষ এক হও' এই আহ্বান জানিয়ে দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানানো হয়। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টির পথ চলার সূচনা সেখান থেকেই।

প্রথম আন্তর্জাতিকের (১৮৬৪-৭৬) এক সাধারণ সভায় মার্কস-এঙ্গেলসের উপস্থিতিতে একদা কলকাতা থেকে প্রেরিত জনৈক পত্রলেখরের চিঠি পাঠ করা হয়। তিনি এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কল্পে, মেহনতি মানুষের দুর্গতি ঘোচাতে ওই পত্রে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে এদেশে শাখা খোলার জন্য আবেদন জানান। যদিও শেষ পর্যন্ত তখন তা খোলা সম্ভব হয়নি।

১৮৮১ সালে তিলক তাঁর লেখায়-শ্রম, সম্পদ, শ্রেণি ইত্যাদি প্রশ্নে মার্কসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উল্লেখ করেন।

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লালা হরদয়াল—'কার্ল মার্কস এ মর্ডান ঋষি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (১৯১২)।

কাকাবাবু, নজরুল ইসলাম প্রমুখরা লাঙ্গল, গণবাণী ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে এ দেশে শ্রমিক, কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করতে উদ্যোগী হন—কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার সেই প্রথম উষাকাল থেকেই।

ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রবাসে ১৯১৪ সালে 'বার্লিন কমিটি' গঠন করেন। যার অন্যতম সদস্য ছিলেন—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা বৃটিশের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়িয়ে জার্মানিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা আনুষ্ঠানিক এক চুক্তির মাধ্যমে জার্মানির সহায়তায় ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিরেন। সেই চুক্তির ১০ নং ধারায়—ভারতে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তন করার কথা বলা হয়। অস্ট্রো জার্মান শক্তি তাতে বাধা দিতে পারবে না বলে উল্লেখ করা হয়। জার্মান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বিচারিতা বুঝতে অসুবিধা হয়নি বামবিপ্লবীদের তা এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

**ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা :**

সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর ভারতীয় বিপ্লবীদের শেষ পর্যন্ত জার্মানি যে সাহায্য করবে না সে বিষয়ে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বিপ্লবীরা নিশ্চিত ছিলেন। কাজেই লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী কাজে তাদের সাহায্য করবে সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিলেন। তাই ভারতীয় মুক্তি সংগ্রাম আর কমিউনিস্ট পার্টি উভয়েরই ভরকেন্দ্র হযে ওঠে রাশিয়া।

এভাবে ভারতের ভিতর পাঞ্জাব থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত দেওবন্দী গ্রুপ, কাবুলে মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের গ্রুপ, সেখানে খিলাফৎ গ্রুপ আবার ভারতের বাইরে আমেরিকায় গদর পার্টি, জার্মানিতে বার্লিন কমিটি, তাছাড়া ফ্রান্স, মেক্সিকো, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে আরো কয়েকটি দল সকলেরই ঠিকানা হযে ওঠে মস্কো। এভাবে সকলে ব্রিটিশের রক্তচক্ষু এড়িয়ে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেকিস্তানের তাসখন্দ শহরে সকলে মিলিত হন, এবং সেখানেই প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলাবাহুল্য, লেনিনের প্রেরণা না থাকলে সুদূর তাসখন্দে গিয়ে ভারতীয়দের পক্ষে একাজ করা সম্ভব হত না। ১৯২১ সালে—ভারতের অভ্যন্তরে মুক্তি সংগ্রামে কাজ করবে এই শর্তে কমিন্টার্ণ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে—ভারতীয় বিপ্লবী এম এন রায় মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে মস্কোয় ঔপনিবেশিক পরাধীন দেশগুলির মুক্তি সংগ্রামের রণকৌশল নিয়ে লেনিনের সঙ্গে ঐতিহাসিক বিতর্কে অবতীর্ণ হন।

মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে—ইতিমধ্যে ভারতের ভিতর কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর বিভিন্ন শহরে কমিউনিস্ট গ্রুপ হিসাবে কাজ করতে থাকে। কলকাতা থেকে মুজফ্ফর আহমেদ এইসব গ্রুপগুলিকে সংগঠিত করতে থাকেন। ফলস্বরূপ গোটা দেশে শ্রমিক কৃষক মুক্তি আন্দোলনে নতুন জোয়ার আসে।

১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি কানপুরে মিলিত হয়ে পার্টির একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে চায় (যদিও এটি টেকে নি)। এর সাধারণ সম্পাদক হন সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে।

**পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি :**

জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলার বহু আগেই এ দেশে মুক্তি আন্দোলনে প্রথম এই দাবি তোলা হয়েছিল বামপন্থীদের পক্ষ থেকে।

১৯২১ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব প্রথম পেশ করা হয় বামপন্থীদের পক্ষ থেকে। এম এন রায় এবং অবনী মুখোপাধ্যায় যৌথ ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নামে একটি ইস্তাহার রচনা করে তা প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করেন। তাতে লেখা ছিল —ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও একটি সার্বভৌম যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র গঠনই কমিউনিস্টদের প্রধান লক্ষ্য। এই প্রস্তাব অধিবেশনে উত্থাপন করেন মৌলানা হসরত মোহানি। যিনি উপরে উল্লেখিত কানপুরে যে পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১৯২৫) তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন।

১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে একই ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন—সিঙ্গারা ভেলু চেট্টিয়ার। যিনি কানপুরে ১৯২৫ সালে হওয়া পার্টি সম্মেলনে সভাপতিত্ব

*—এরপর চারের পাতায়*

# স্বাধীনতার ৭৫ বছরে বীরাঙ্গনাদের স্মরণে

**রীনা মিত্র**

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক দিন। এই দিনটি এসেছে অগণিত শহিদের রক্তের বিনিময়ে। স্বাধীনতাযোদ্ধা হিসাবে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো নারী গৃহকোণে, অন্তরালে থেকে তাঁদের স্বামী, ভ্রাতা, বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। গোপনে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে, আক্রান্ত ও অসুস্থ বিপ্লবীদের সেবা যত্ন করে স্বাধীনতা আন্দোলনে সহযোগী হয়েছেন। আবার অনেক নারী সম্মুখ সমরে বোমা বন্দুক পিস্তল নিয়ে মোকাবিলা করেছেন ব্রিটিশদের সঙ্গে। তাঁদের বুক থেকে রক্ত ঝড়েছে, মুখ থেকে একটি শব্দ বের করতে পারেনি ব্রিটিশ পুলিশ। জেল খেটেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে এই সমস্ত নারীদের অবদানের কথা স্মরণ করে দু-চার কথা—

অন্দর থেকে ও সামনাসামনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এমন কয়েকজন বর্ধমানের মহিলা :

**দুকড়িবালা দেবী :** নিবারণচন্দ্র ঘটকের মাসিমা দুকড়িবালা দেবীর অস্ত্র আইনে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। অবিভক্ত বর্ধমানের রানিগঞ্জে সিয়ারসোল গ্রামে যুগান্তর দলের সংগঠনের মধ্যমণি নিবারণচন্দ্র ঘটক মহিলাকর্মী হিসেবে মাসিমা দুকড়িবালা দেবীকে পেয়েছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত মহিলা স্বদেশী।

**বিমলপ্রতিভা দেবী :** বিমানবাহিনীর মধ্যে গোপন সংগঠন গড়ে তোলার কাজে রবীন সেন বিমান বাহিনী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে অবিভক্ত বর্ধমান জেলার আসানসোল রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কাজ করতে এলে বিমলপ্রতিভা দেবী স্বেচ্ছায় তাঁর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁরই উৎসাহে শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন রবীন সেন।

**বিভা কোঙার :** বর্ধমানের স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্ত্রী বিভা কোঙার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী হিসেবে কাজ করেছেন।

**কনক মুখার্জী :** চিরপরিচিত স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সরোজ মুখার্জীর স্ত্রী কনক মুখার্জী স্বামীর কাজে সহযোগিতা করা ছাড়াও নিজে সক্রিয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন।

**রমারানি তা :** বর্ধমানের স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃষক সংগঠক দাশরথি তা-এর স্ত্রী রমারানি স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত কাজে স্বামীর পাশে থেকে সাহায্য করেছেন।

**রাবেয়া বেগম :** বর্ধমানের স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিউনিস্ট সংগঠক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ সাহেবের স্ত্রী রাবেয়া বেগম স্বাধীনতার কাজে স্বামীকে উৎসাহিত করেছেন, নিজেও অংশগ্রহণ করেছেন।

**সাধনা ভট্টাচার্য :** বর্ধমানের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিজয় ভট্টাচার্যের স্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। স্বাধীনতার পর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে না থেকে মেমারির কলানবগ্রামে 'শিক্ষা নিকেতন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে ব্রতী হয়েছিলেন।

**শৈবালিনী ঘোষাল :** রায়নার শৈবালিনী ঘোষাল স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, পাঠাগারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অফিস আদালতে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপনের সময় যে মহীয়সী বীরাঙ্গনাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিক হতে পেরেছি তাঁদের জন্য আমি নারী হিসাবে গর্ববোধ করি। সমগ্র নারী জাতির পক্ষে এই দেশপ্রেমিক বীরাঙ্গনাদের স্মরণে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে জানাই প্রণতি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

# মৃত সাফাই কর্মীদের পোষ্যদের চাকুরির দাবিতে ডেপুটেশন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ আগস্ট :** কালনা পৌরসভার কর্মরত অবস্থায় মৃত ২৬ জন সাফাই কর্মীর পরিবারে একজন করে চাকরি দেওয়ার দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এই স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে মৃত সাফাই কর্মীদের পরিবারের লোকজনও অংশগ্রহণ করেন। তারা পৌরসভার সামনে বিক্ষোভও দেখান। উল্লেখিত দাবিসহ অন্যান্য দাবি নিয়ে এদিন পৌর প্রধানকে স্মারকলিপি দেন স্বপন ব্যানার্জি, শর্মিষ্ঠা নাগ ও অলোক রায়। উল্লেখ্য, খুব সম্প্রতি কালনা পৌরসভায় স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। মৃত সাফাই কর্মী বা ১০-১৫ বছর কাজ করা শ্রমিকদের বাদ দিয়ে বাইরের লোকজনকে স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে

নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে বিগত তৃণমূলের পৌর বোর্ডের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে প্রথমে তৃণমূলের একদল কাউন্সিলর বিক্ষোভ দেখান। পরের দিনই সাফাই কর্মীরা পৌরসভার গেটে তালা দিয়ে বসে পড়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান।

# কৃষক নেতার জীবনাবসান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ আগস্ট :** প্রবীণ কৃষক নেতা মান্নান মণ্ডল (৮৫)-এর জীবনাবসান হয়েছে। কালনা-১ ব্লকের কাঁকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মুড়াগাছে গ্রামে নিজস্ব বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বার্ধক্যজনিত রোগে দীর্ঘদিন ভুগছিলেন। খবর পেয়ে আজ সকালে সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি সুকুল শিকদার সহ নেতা কর্মী শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে যান। এদিন শ্রদ্ধা জানান সুকুল সিকদার, আলিম শেখ কালিচরণ সরেন, নির্মল সিংহরায়, গুরু চরণ টুডু, বরুণ ঘোষ,

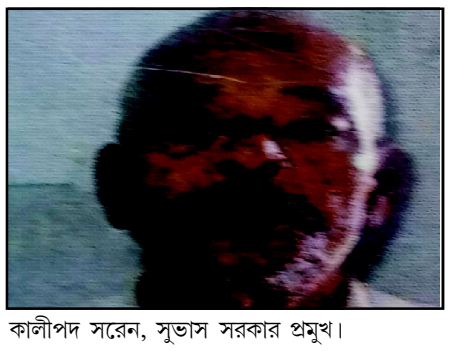

কালীপদ সরেন, সুভাস সরকার প্রমুখ।

# লোক আদালতে মামলার নিষ্পত্তিতে রেকর্ড

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ আগস্ট :** চলতি বছরের তৃতীয় কালনার জাতীয় লোক আদালতে রেকর্ড পরিমাণ মামলা ওঠে। এদিন তিনটি বেঞ্চে মোট ১৭৪০টি মামলার বিচার হলেও নিষ্পত্তি হয় ৪৩০টি মামলার। নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলির অধিকাংশই ছিল ব্যাংকের ঋণ সংক্রান্ত। কালনা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সুধীর কুমার, কালনা সাব জজ ঝিলাম গুপ্ত এবং মুন্সেফ আদালতের বিচারক মেহেজাবিন পারভীনের এজলাসে এই মামলাগুলোতে ৩৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৫ টাকা সেটেলমেন্ট হয়। নগদ আদায় হয় ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৯৫ টাকা। কালনা বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তথা লোকআদালতের বিচারকদের অন্যতম সহকারি আইনজীবী পার্থ সারথি কর বলেন, করোনা আবহে আদালতের কাজ টানা দুই বছর বন্ধ ছিল। ফলে আদালতে মামলার পাহাড় জমছে। তাই লোক আদালতের সংখ্যা ও বেঞ্চ বৃদ্ধি একান্ত জরুরি।

# স্বাধীনতা পঁচাত্তর : প্রত্যাশা-প্রাপ্তি

**শশধর মিস্ত্রী**

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ একটি বর্ণময় দিন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ফাউন্টেন পেন দিয়ে সাদা কাগজের উপর আজ থেকে বহুদিন আগেই এঁকে রেখে গেছেন— ''স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়।'' একটু অন্যভাবে জগৎবিখ্যাত দার্শনিক রুশো বলেছেন 'সব মানুষই স্বাধীন হয়ে জন্মায়'। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর একটি দেশের কাছে গর্বের বিষয়। এক দিকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পঁচাত্তর বছর, আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পঁচাত্তর বছর। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের ভাষায়—''বলো বলো বলো সবে, শত বীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।''

'স্বাধীনতা' শব্দটির দ্বারা নিজের দেশ, নিজের শাসন করবার অধিকার কেবল এটুকু বললেই সবটা বলা হয় না। এই শব্দটির ব্যবহার, ব্যঞ্জনা বহু বিস্তৃত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষায় বাংলার প্রান্তজ মানুষের এক বিশেষ আর্তি তথা প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেছেন—''নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল আল্লা! আমাকে যতখুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাটির ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি তার কসুর তুমি যেন মাফ করো না।'' আবার কবি নজরুল ইসলাম একই আশা অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন—''ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ চায় দুটো ভাত একটু নুন।''

'স্বাধীনতা' শব্দটির প্রয়োগ, শাসকের ভাষায় অপপ্রয়োগের জন্য দেশে বিদেশে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। আমাদের দেশে কবি নজরুল ইসলামকে কেবলমাত্র স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে কবিতা লেখার জন্য (আনন্দময়ীর আগমন) জেলে যেতে হয়। আফ্রিকার কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে কবিতা লেখার জন্য মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসির দড়ি গলায় পরবার ঠিক আগেই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—''একটি মাত্র জীবন আমার আমি তা স্বাধীনতাকে দিলাম।'' স্বাধীনতা শব্দটির ওজন এর থেকে খানিকটা বোঝা যায়। আমাদের দেশে ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-কৃষক-মহিলা-বুদ্ধিজীবী-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কেবলমাত্র স্বাধীনতাকে ভালোবেসেই অকাতরে দেশমাতার চরণতলে নিজেকে আহুতি দিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, অবদানের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব এসে বর্তায় স্বাধীনতার পরবর্তী দেশ পরিচালন, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও স্বাধীন নাগরিকদের।

স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্তে জহরলাল নেহেরু কম্বু কণ্ঠে রেডিও মারফৎ আমাদের বলেছিলেন—''দারিদ্র, অজ্ঞতা, রোগ-ব্যাধি এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান হবে আশু কর্তব্য।'' স্বাধীনতার প্রাক্‌পর্বে এর থেকে আর কোনো প্রত্যাশা বা বড় স্বপ্ন হতেই পারে না।

সত্যের আহ্বান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—''যুদ্ধ যখন চলে, তখন কবি রেখে দেন তার বীণা....যুদ্ধ শেষ হবার পরই তিনি গাইতে পারেন নিজের সুরে।'' যে কোনো পরাধীন দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন একটি বড় যুদ্ধ আর তা অর্জনের পর নতুন প্রত্যাশা অনিবার্যভাবেই এসে যায়। পঁচাত্তর বছর পর তার হিসাব দেওয়া এবং নেওয়া খুবই জরুরি।

১৯১৬ সালে গান্ধীজি লিখলেন— ''ইন্ডিয়া ইজ এ কান্ট্রি অফ ননসেন্স।'' কারণ তখন রেল স্টেশনে নিয়ম ছিল যাত্রীদের জন্য 'হিন্দুপানি' আর 'মুসলমান পানি' আলাদা করে সরবরাহ করা। এই মানুষটিকেও দেশভাগের ফলে পাকিস্তানকে তাদের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হোক এই বলায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি ১০ লক্ষ। এখন প্রায় ১৩০ কোটি। এই মানবসম্পদকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে দেশগঠনের মাত্রা মাত্রা-ছাড়িয়ে যেতে পারে। স্বাধীনতার সময় দেশে সাক্ষর মানুষ ছিলেন ১০ শতাংশ এখন ৭৪.০৪ শতাংশ। পঁচাত্তর বছরে এটা গর্বের নয়, এটা ব্যর্থতা। কারণ এর জন্যই আমরা সমগ্র বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করেছি নিরক্ষরতায়। এ কলঙ্ক মুছতে আর কত বছর লাগবে কে জানে? দেশে এখনও গরিবেরও গরিব ৩৭ শতাংশ মানুষ। আর ৭০ শতাংশ মানুষের উপযুক্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই। এমনকি ২০ শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে আজও বঞ্চিত।

আবার ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে গবেষণা ও অগ্রগতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এটা আমাদের গর্বের। প্রাচীন কালে ভারতের বিজ্ঞান সাধনা ছিল বিশ্বের উন্নত দেশগুলির অনেক উপরে। আর্যভট্ট, বরাহ মিহির, চরক, শুশ্রুত আজও বিশ্বে প্রাতঃস্মরণীয়। এমনকি ইংল্যান্ডের মানুষ যখন কাঁচা মাংস খেত তখন আমাদের দেশে পুস্তক সৃষ্টি হয়ে গেছে (ঋক্‌বেদ) এ কম গর্বের কথা নয়।

স্বাধীনতা লাভের আগে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ভারতীয় বিজ্ঞানের স্বর্ণ-যুগে, সি.ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, কে.এস. কৃষ্ণান, রামানুজম প্রমুখ বিজ্ঞানের মণি-মানিক্য ভারতীয় বিজ্ঞানকে বিশ্ব বিজ্ঞানের প্রথম সারিতে পৌঁছে দেয়।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে মৌলিক বিজ্ঞানের সাথে সাথে প্রয়োগ বিজ্ঞানের চর্চাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, বিক্রম সারাভাই, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, এস.এস. স্বামীনাথনের মতো বিজ্ঞানীদের গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করেছে।

আমাদের দেশ এখন খাদ্যশস্য উৎপাদনে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞান ও পরমাণু বিজ্ঞানে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির থেকে আমরা খুব বেশি পিছিয়ে নেই। টেলি কমিউনিকেশন ও কম্পিউটার সফটওয়ারে ভারত বিশ্ব পর্যায়ে সম্ভ্রম আদায় করতে পেরেছে, কিন্তু অনেক স্বপ্ন নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে ভারতের বিজ্ঞান যে যাত্রা শুরু করেছিল আজ যেন সেই পথের দিশা হারিয়ে গেছে। ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা মূলত সরকার-নির্ভর। এর সিংহভাগ ব্যয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বহন করে থাকে। ৮৪ শতাংশ সরকারি ও ১৬ শতাংশ বেসরকারি সংস্থা থেকে আসে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে গবেষণা খাতে ব্যয় ছিল ২০ কোটি টাকা। অষ্টম পরিকল্পনায় তা পৌঁছায় ১৭, ৫২৯ কোটি টাকায়। কিন্তু এখন অর্থাভাবে জাতীয় গবেষণাগারগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা গবেষণা করে কোনও দেশের বিজ্ঞান বাঁচে না।

বিজ্ঞানকে দেশের অগ্রগতির হাতিয়ার ধরে একটা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত কাঠামো পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকে গড়ে তোলা হয়েছিল। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা পঞ্চাশের দশকে পার্লামেন্টে বিরোধীপক্ষের আসন (সিপিআই) থেকে দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞানের গুরুত্বকে তুলে ধরেন। পণ্ডিত নেহেরু তাঁকে সম্মান দিয়ে সবটা না হলেও অনেকটা গ্রহণ করেন। যদিও ড. সাহার দামোদর নদী পরিকল্পনার সবটার নেহেরু মানত্যা দেননি, তা যদি দিতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড অনেক সুফল পেত। তবুও অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি (ও.এন.জি.সি), থার্মাল ও জল বিদ্যুৎ কর্পোরেশন, নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন, সিন্ধ্রি ও পরবর্তী একাধিক কয়লা-নির্ভর সার শিল্প, ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস, এইচ.এম.টি প্রভৃতি উচ্চমানের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি ওই সময় গড়ে ওঠে। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত বিপুল ক্ষেত্রগুলি ব্যক্তি-মালিকানায় চলে যাচ্ছে। উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও সদিচ্ছার অভাব হলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে মারাত্মক বিপদ নেমে আসবে একথা মেঘনাদ সাহা অনেক আগেই পার্লামেন্টে উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর ভাষায়, ''আমরা মানব শিশুর জন্ম দিতেছি কিন্তু উহাদিগকে সমর্পণ করিতেছি নেকেড়ের বাঘের মায়ের কোলে। নেকড়ে মায়েরা হয় শিশুগুলিকে গিলিয়া খাইবে, নয়ত শিশুগুলিই নেকেড়ে বাঘ হইয়া উঠিবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প আর মানব শিশু থাকিবে না।''

এখন ভারতবর্ষের বি.এস.এন.এল সহ অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির দুরবস্থা সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

সম্রাট অশোকের আমল থেকে শান্তির নীতি, সম্রাট আকবরের সময় থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী, ভারতীয় সংবিধানের যা মর্মবাণী, তা আজ ভূলুণ্ঠিত। বেকারের হাহাকার, কর্মহীনতার অভিশাপ ভারতভূমিকে আজ করে তুলছে বিপন্ন থেকে বিপন্নতর। ভ্রাতৃঘাতী, শিশুঘাতী উল্লাস ও নারীজাতির অসম্মান আমাদের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরকে গৌরবান্বিত না করে আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছে। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, স্বাধীনতাকেই আজ প্রহসনে পরিণত করে তুলেছে। তবুও আমরা আশাবাদী—

''এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না।
এই শ্মশান ভূমি আমার দেশ না।''

# সড়ক বেহাল, বিপাকে চার গ্রামের মানুষ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১১ আগস্ট** : পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাকর গ্রামের সড়ক চরম বেহাল। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন নাদনঘাট ও বগপুর এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। নবদ্বীপ-বর্ধমান সড়কের জাকর মোড় থেকে লক্ষ্মীপারা ফেরিঘাট পর্যন্ত প্রায় তিন কিমি সড়ক ২০১৫ সালে নির্মাণ করে কৃষি বিপণন দপ্তর। তারপর থেকে এই সড়কে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে বড় বড় খাদের সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে বকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাকর এবং নাদনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লক্ষ্মীপারা (নোকপারা), গৌরীডাঙ্গা, এবং গহক গ্রামবাসীরা চরম বিপাকে পড়েছেন। এই সড়ক চলার অযোগ্য হয়ে ওঠায় এই চার গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের রাজিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি সড়কটি সংস্কার করে চলাচলের যোগ্য করে তোলা হোক। স্থানীয় বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শহিদুল শেখ রাস্তাটির

বেহালের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, আমরা পঞ্চায়েত থেকে খুব শীঘ্রই খানাখন্দ বোজানোর জন্য কিছু ব্যাটস ফেলবো। ভালোভাবে সড়কটি সংস্কার করবে কালনা মহাকুমা কৃষি বিপণন দপ্তর। দপ্তরের একজন আধিকারিক দেবু রায় বলেন, আমরা চার মাস আগে সড়কটি সংস্কার করার প্রকল্প আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি। এখনো পর্যন্ত প্রকল্পটির অনুমোদন পাইনি।

# প্রান্তজন—আত্মজন (৬৭)

## রত্না রশীদ

ঘটনার ঘনঘটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। চোখে দিশে লেগে যাচ্ছে। মন্ত্রীত্বের চেয়ারে আলোকিত হয়ে সেঁটে আছেন মহাসচিব তকমা সমন্বিত মহাশ্রেষ্ঠ চোর, না সাধু ভাষায় বলি, মহাশ্রেষ্ঠ তস্কর। স্বপ্নেও ভাবনি কখনো টাকার পাহাড়, গয়নার সমুদ্দুর, ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের আকাশ ডিঙোনো সংখ্যা একটা মানুষের হতে পারে। ছোটো বেলায় 'আলিবাবা চল্লিশ চোর'-এর গল্পের গুহায় এমন লোটামালের খবর শুনেছিলাম। এতো স্বচক্ষে দেখলাম এক চোরের হিমশৈলের চূড়ামাত্র চোরাই মালের গুহা!

এই দলটার প্রত্যেকটা নেতা-মন্ত্রীর হাতে জড়ানো লাল মোটা দাগা। হাতে দশ আঙুলে চল্লিশটা পাথর। কোমরে গলায় আরো কিছু থাকতে পারে যা দেখতে পাওয়া যায় না। আর মগজ ঠাসা লোভ, লালসা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা আর পরের ধন মেরে নিজের পেট মোটা করার নৃশংস ধান্দাবাজি। পুলিশ আইনবিভাগ এটা প্রমাণ করতে পারুক আর নাই পারুক, পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ এই প্রথম দেখলো চোরের সমর্থনে রাজনৈতিক মিছিল। ...চুরি করা আমাদের মৌলিক অধিকার...চোর ধরা চলবে না। ...চলবে না। পৃথিবীর লোক দেখছে কিভাবে একাধিক প্রমাণিত চোরকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে সুরক্ষিত রাখা হয়।

এদের নাম কলমে আনতে ঘেন্না করে। কালীভক্ত বীরভূমরাজ কালীকে দু'শো ভরির সোনার হার, পঞ্চাশ কেজি রুপোর মুকুট, রাশি রাশি টাকার উপঢৌকন দিয়ে নিশ্চিত ছিল তার টিকিটিও কেউ ছুঁতে পারবে না। কিন্তু কেন্দ্র কি রাজ্য দুটো সরকারই এই পুজো রূপ ঘুষের মাহাত্ম্য সম্যকভাবে বোঝে বলেই দেশজুড়ে এমতো ঘুষ প্রদানের মন্দির মসজিদের রমরমা। এবার চোরে চোরে তো মাসতুতো ভাই। পুরো দেশটাকে মামাবাড়ি বানিয়ে চোর পুলিশ খেলতে খেলতে বখড়ার ভাগাভাগির কারণে একটা দুটোকে ডালে তুলে সাময়িক কড়কানি দিচ্ছে। এদের এই পুরোপুরি চোর-ডাকাত দলের কারো কখনো কোনো শাস্তি হয়নি। মাঝে মাঝে দুয়েকটা পাঁঠা বলির প্রয়োজন পড়ে, বাকিটা ম্যানেজেবল্ হলদে গোলাপের তোড়া, দামি সুদৃশ্য উত্তরীয়, সেরা সন্দেশের নৈবেদ্য সমেত বন্ধ দরজা ডাকাতে-ডাকাতে আলোচনায় সেটিং হয়ে যায়। তাই না প্রকাশ্যে লম্ফঝম্ফ করতে সাহস পায়—মেরে শুঁটিয়ে দেবো, হাড় গুঁড়ো করে দেবো, আরো আরো কত মানুষ-কে কতো অপমান, অসম্মান, কান ধরে ওঠবোস করানো, বাড়ির পর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া। মূর্খ, গুণ্ডা, তোলাবাজ, মালপাচারকারী, দুশ্চরিত্র, পুজো নামের ঘুষদাতা, দশবার ডাকলেও আইনের ডাক অগ্রাহ্য করা বনমানুষটাই শাসক দলের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন বুক ফুলিয়ে। এসব মানুষ আর কতোদিন সহ্য করবে। সহ্য করাটাও কিন্তু অন্যায়। মানুষ যতদিন এটা না বুঝবে, ততদিন মগের মুলুক চলবে। পুলিশ প্রশাসন সব জায়গায় ওরা টাউট পুষে রেখেছে। এখন মানুষ যদি একযোগে শুভচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একজোটে ওদের সমূলে উৎখাত করতে রাস্তায় নামে, তবেই আশার আলো ফুটতে পারে। সবটাই মানুষের হাতে। সাধারণ মানুষের হাতে। সেই ঠিক করবে পড়ে পড়ে মার খাবে, নাকি একজোট হয়ে অপশাসন নির্মূল করবে।

(চলবে)

# স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের উজ্জ্বল ভূমিকা

*—দুয়ের পাতার পর*

করেছিলেন। শুধু তাই নয়, উনিই এ দেশে প্রথম মে দিবস পালন করে রক্ত পতাকা উড়িয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য, জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এর বহু পরে ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে এই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল যার পিছনে দীর্ঘদিনের বামপন্থীদের বারে বারে তোলা জোরালো দাবির চাপ ছিল।

১৯২৬ সালে কংগ্রেসের গৌহাটি সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এক ইস্তাহার বিলি করে বলা হয়—জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য যদি স্বাধীনতা না হয় তাহলে এর কোনো অর্থই থাকে না। পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ হল—জনগণের নিজের সরকার প্রতিষ্ঠা করার স্বাধীনতা।

১৯৩০-৩৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক সময়। ১৯৩৩ সালে 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকসন' নামক প্রথম এক জাতীয় ইতিকর্তব্যের দলিল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে হাজির করা হয়। সেখানে ঘোষণা করা হয়েছিল—(১) ভারতীয় জনগণের দাসত্ব ঘোচাতে হবে। (২) শোষিত বঞ্চিত শ্রমিক কৃষকদের মুক্তি দিতে হলে স্বাধীনতা অর্জন জরুরি। (৩) মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চূর্ণ করতেই হবে। (৪) কৃষি বিপ্লবের পথেই বৈপ্লবিক মুক্তি অর্জন করতে হবে।

এছাড়া ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রভ—ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গড়ে তোলার যে ঐতিহাসিক আহ্বান জানিয়েছিলেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেও তার গভীর প্রভাব পড়েছিলো। এর পরিণতিতে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ এক প্রভাবশালী ধারার জন্ম দেয়। আমাদের মতো ঔপনিবেশিক শাসন শৃঙ্খলিত দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চ এইভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের 'ভুল সময়' নির্বাচনকে চিহ্নিত করে হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণের ঘটনার পর 'জনযুদ্ধের রণধ্বণি' বামপন্থীদের পক্ষ থেকে তোলা হয়। সেই সময় ফ্যাসিবাদের পরাজয় যে কত জরুরি ছিল আজকের নব্য ফ্যাসিবাদের দেশে দেশে উত্থান ও বিপদ, তা বারেবারে স্মরণ করায়।

**কমিউনিস্ট পার্টির উপর আক্রমণ :**

তাসখন্দ থেকে ভারতীয় কমিউনিস্টদের এ দেশে প্রবেশে ব্রিটিশরা ভয় পেয়েছিল। তাই পাঁচ পাঁচটি পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্টদের জড়িয়ে দেওয়া হয় (১৯২১-২৭)।

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৩-২৪) মুজফ্ফর আহমেদ, শওকত্ উসমানি, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, প্রমুখ কমিউনিস্টদের সশ্রম করাদণ্ড দেওয়া হয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাটি (১৯২৯-৩৩) ছিল সেই সময় সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ফৌজদারী মামলা। সারা পৃথিবী এই মামলা আলোড়িত হয়। বহু কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে বেছে বেছে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এই মামলায়—যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কাজ করছিলেন একনিষ্ঠ ভাবে।

এই মামলায় এজলাসকে কাকাবাবু সহ নেতৃত্ব ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

জন্ম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিকে ভয় পেয়ে মামলা মোকদ্দমা, জেল, জরিমানা যখন আর পেরে উঠলো না তখন তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়। তবে নিষিদ্ধ অবস্থায় পার্টির শক্তিবৃদ্ধি পেতে অসুবিধা হয়নি।

**কমিউনিস্ট পার্টির দুর্বলতার কয়েকটি দিক :**

বস্তুনিষ্ঠ ভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাস চর্চা করলে কমিউনিস্টদের ভূমিকা যথেষ্ট গৌরবের। এই ইতিবাচক ভূমিকা স্মরণে রেখেই দুর্বলতা ও ভুলগুলি অনুসন্ধান করা উচিত।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির দেওয়া 'জনযুদ্ধের' স্লোগান, অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্গে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে যুক্ত করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পার্টির কর্তব্যকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে গেছে। হরকিষাণ সিং সুরজিত মন্তব্য করেছেন—"তত্ত্বগত দিক থেকে বলা যায়, আন্তর্জাতিক স্তরের দ্বন্দ্বগুলিকে জাতীয় স্তরের দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করতে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যর্থ হয়েছিল।"

সুভাষচন্দ্রকে দেশান্তরী হতে সাহায্য করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে আচ্চার সিং চীনা, ভগতরাম তলোয়ার প্রমুখ কমিউনিস্টরা ছিলেন। একই ভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার ছিলেন কমিউনিস্টরাই।

দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পাকিস্তান প্রশ্নে—কংগ্রেস, মুসলিম লীগের মধ্যে দরকষাকষি চলতে থাকলে কমিউনিস্ট পার্টি তখন স্পষ্ট অবস্থান নিতে পারেনি। নাম্বুদিরিপাদের মতে—'পার্টি কর্মীরা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখন লীগ ও কংগ্রেসের দর কষাকষির স্বরূপটা উদঘাটিত করে দেওয়ার কাজটা পার্টি করতে পারেনি।"

**কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা :**

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গৌরবোজ্বল ভূমিকার জন্য ভিন্ন ধারার স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাবে জেলখানায় বসে বিপ্লবীদের মধ্যে মার্কসবাদ চর্চা বৃদ্ধি পায়। আব্দুল হালিম, সরোজ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সেন, কালী সেন, নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেন প্রমুখ। সেলুলার, প্রেসিডেন্সি, হিজলি, আলিপুর, মেদিনীপুর ঢাকা জেলখানাগুলি কমিউনিস্ট মতাদর্শ চর্চার পাঠশালার পরিণত হয়।

গদর পার্টির নেতারা, ভগৎ সিং এর সহযোদ্ধারা, মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গীরা, সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠরা, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের যোদ্ধাদের একাংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি মোহভঙ্গ আর সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন তাদের কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে সমবেত করে। আন্দামানের সেলুলার জেল, রাজপুতনার দেউলি জেল, বাংলার প্রেসিডেন্সি—জেলবন্দিরা কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হয়ে পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। যেমন—প্রমোদ দাশগুপ্ত, সতীশ পাকড়াশী, নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বিজয় মোদক, অমৃতেন্দু মুখার্জী। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য বৃদ্ধি পায়—১৯৩৩—১৫০ জন, ১৯৩৯—১৫০০ জন, ১৯৪২—৪৪০০ জন।

১৯৪৩ সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত পার্টির প্রথম কংগ্রেসে যাঁরা প্রতিনিধি হয়েছিলেন, তাঁদের ৭০ শতাংশই এক বা একাধিকবার ব্রিটিশের জেলে বন্দি ছিলেন। এই প্রতিনিধিদের জেলে থাকার মোট মেয়াদের যোগফল দাঁড়ায়—৪১১ বছর।

**মেকি দেশপ্রেমী কারা? কারা আসলে গদ্দার?**

জনৈক মারাঠি ছদ্মনামে 'কে হিন্দু' নামে সাভারকার একটি পুস্তিকা লেখেন। এখানে হিন্দু-মুসলমান দ্বি-জাতি তত্ত্বের কথা তুলে ধরা হয়। অপর এক আর এস এস নেতা - বি, এস, মুঞ্জে ফ্যাসিস্ত শাসনের প্রতি গভীর আস্থা জানিয়ে ইতালিতে শিক্ষা নিতে যান। মুসলিনির পরামর্শ নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। পরবর্তী কালে গোলওয়ালকার We Or Our Nation Hood Defined' ,এবং 'Bunch Of Thoughts' গ্রন্থে বিযাক্ত হিন্দুত্ববাদের প্রচার করেন। এই দুটি বইকে হিটলারের আত্মজীবনী—'মেইনক্যাম্ফ' গ্রন্থের দেশী সংস্করণ বলা হয়।

গণপরিষদে যখন তেরঙ্গা জাতীয় পতাকাকে স্বীকৃতি দিয়ে, পতাকার মাঝে অশোকচক্রকে গ্রহণ করে, প্রতিবাদে সংঘের মুখপত্র 'The Organiser' স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের দিন লেখে—তিন সংখ্যা অশুভ। স্বাধীনতার ঝান্ডা হবে একরঙা—গেরুয়া। এর পক্ষে জোড়াল সওয়াল করেন গোলওয়ালকার। 'মনু স্মৃতি'-কে সংবিধানের গৃহীত খসড়ায় মান্যতা না-দেওয়া হলে তিনি তার তীব্র সমালোচনা করেন এবং সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

ডিসেম্বর, ১৯৪০ গান্ধীজি যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন তখন আর এস এস- নেতৃত্ব ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিবকে তাদের থেকে 'সিভিল ভলেন্টিয়ার' নিয়োগ করতে অনুরোধ করে যাতে ঐ আন্দোলনকে দমন করা যায়। এই সংগঠনটি দাবি করে এখন শক্তিক্ষয় না করে, তা মজুত রাখতে হবে, ব্রিটিশ নয়, অন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

স্বাধীনতার পর আর এস এস-এর সংখ্যাগড়িষ্ঠ নেতৃত্ব কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করে কংগ্রেসের ভিতর ঐতিহ্যবাহী হিন্দু গোষ্ঠীর সদস্য থেকেই রাতারাতি মেকি স্বাধীনতা সংগ্রামী সেজে ওঠেন।

১৯৪৮ এর ৩০ জানুয়ারি নাথুরাম গডসে গান্ধীকে হত্যা করার পর আর এস এস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও এক বছরের কিছু সময় পরেই এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে তুষ্ট করার লক্ষ্যে। এতে মুখ্য ভূমিকা নেন প্যাটেল। তাই আজ প্যাটেলের বিশাল মূর্তি নির্মাণ করে সেদিনের কৃতজ্ঞতার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়েছে।

আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে আবেগ বহির্ভূত ইতিহাসের স্বচ্ছ আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত কারিগর কমিউনিস্টদের চিনে নিতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়না। একই সাথে সেদিনের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, এযুগে দেশভক্ত সাজা রাজনৈতিক দলটির ফন্দি ফিকিরগুলিও বুঝতে যেন অসুবিধা না হয়।

*—প্রথম পাতার পর*

# যুবদের মিছিল ও বিক্ষোভ

করলেই হবে না। এরকম হাজারো পার্থ চ্যাটার্জি ও অনুব্রত মণ্ডল গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিতে হবে। পূর্বস্থলী বাজারে চোর ধরো জেল ভরো কর্মসূচির সভায় বলেন প্রবীর দেবনাথ। ছাত্র যুব ও মহিলা সংগঠনের পূর্বস্থলী-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সভার পাশাপাশি মিছিলও হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন যুবনেতা বীরেশ্বর নন্দী, মীর রজব আলী, বাসন্তী কুরি, ভারতী দাস, রাজেন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা